Vol. 55 | No. 1 | 2017

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রনাথের জাপান-যাত্রী : জাপানের সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতির রূপায়ণ

Volume	55
Issue	1
Year	2017
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Md. Jashim Uddin
Published online	October 1, 2017
DOI	10.62328/sp.v55i1.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v55i1.8
Pages	১২৩-১৪০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

রবীন্দ্রনাথের *জাপান-যাত্রী* : জাপানের সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতির রূপায়ণ

মো. জসিম উদ্দিন*

সারসংক্ষেপ : রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসাহিত্য শিল্পমানে ও পরিমাণে সমৃদ্ধ। তিনি বহুবার বিদেশভ্রমণ করেছেন; কখনো কোনো দেশের আমন্ত্রণে, কখনো বক্তৃতা দিতে, আবার কখনো বা নিছক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। অনুসন্ধানী মন নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন প্রায় সারা বিশ্ব। ভ্রমণের এই অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁর ভ্রমণসাহিত্য, দিনলিপি ও চিঠিপত্রে। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির প্রায় বছর তিনেকের ব্যবধানে তিনি জাপান যান এবং সেদেশে প্রায় তিনমাস অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি জাপানের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে অবস্থান করেছেন, সেখানকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিচিত্র বিষয়ে বক্তৃতা করেছেন; প্রত্যক্ষ করেছেন জাপানিদের জীবনযাপন পদ্ধতি, জেনেছেন জাপানের সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে, বুঝতে চেষ্টা করেছেন অর্থনৈতিক-প্রযুক্তিগত দিক থেকে জাপানের বিস্ময়কর উত্থানের কারণ; এবং সর্বোপরি জাপানের সমাজজীবনের নানা কিছুর সঙ্গে তুলনা করেছেন আমাদের দেশের সমাজজীবনকে। বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের *জাপান-যাত্রী* (১৩২৬ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থে উপস্থাপিত জাপানের সাহিত্য ও সমাজ-সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধানের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।

ভ্রমণসাহিত্যের জন্ম ও বিকাশ মূলত প্রবন্ধের গোত্রে। প্রবন্ধ, দিনপঞ্জি, পত্র, আত্মজীবনী প্রভৃতি আঙ্গিককে অবলম্বন করেই রচিত হয় ভ্রমণসাহিত্য। আবার এটাও অস্বীকার করা যায় না যে, ভ্রমণসাহিত্যের সঙ্গে উপন্যাসশিল্পের যোগ নেই। ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, তথ্য, স্থানিক বিবরণ ইত্যাদি যখন আবেগ-অনুভূতির স্পর্শে, ভাষার ঐশ্বর্যে, দার্শনিক জিজ্ঞাসায় ব্যক্তিগত স্তর থেকে উত্তীর্ণ হয় সব মানুষের আস্বাদন ও উপলব্ধির স্তরে, তখন তাকে বলা যায় ভ্রমণসাহিত্য। (কুন্তল ২০১২ : ৪০১) ভ্রমণসাহিত্যের ভাষামাধ্যম যেহেতু গদ্য, তাই বলা যায় বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের জন্ম বাংলা গদ্যের জন্মের ঈষৎ পরবর্তীকালে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে। মধ্যযুগের বাংলা

* লেকচারার, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

https://doi.org/10.62328/sp.v55i1.8

সাহিত্যে ভ্রমণের নানা বিবরণ পাওয়া গেলেও সেগুলোকে ভ্রমণসাহিত্য বলা যায় না। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৪-১৮৮৯) *পালামৌ*, শিবনাথ শাস্ত্রীর (১৮৪৭-১৯১৯) *ইংলন্ডের ডায়েরী*, শ্রীজলধর সেনের (১৮৬০-১৯৩৯) *হিমালয়*, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৬৩-১৯৪৯) *চীনযাত্রী* প্রভৃতি বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের প্রথম পর্যায়ের সাহিত্য। তাছাড়া শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু (১৮৫৩–১৯৩৯), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২–১৯২৩), অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪–২০০২), প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫–১৯৮৩), সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪–১৯৭৪), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৩–২০১২) প্রমুখ ভ্রমণসাহিত্য রচয়িতা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। এর মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায়ের *পথে-প্রবাসে* (১৯৩১), সৈয়দ মুজতবা আলীর *দেশে-বিদেশে* (১৯৪৯) বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সাম্প্রতিককালে নবনীতা দেবসেন (জন্ম. ১৯৩৮), হাসনাত আবদুল হাই (জন্ম. ১৯৩৯), মঈনুস সুলতান (জন্ম. ১৯৫৬), ফারুক মঈনউদ্দীন (জন্ম. ১৯৫৮), শাকুর মজিদ (জন্ম. ১৯৬৫) প্রমুখ সমৃদ্ধ করে চলেছেন বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের ধারাকে।

বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের পালাবদল ঘটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) হাত ধরেই। ভ্রমণসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের লেখনী সৃষ্টি করেছে এক স্বতন্ত্র ধারা। তাঁর পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক কোনো লেখকেরই ভ্রমণের এত ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের অভিজ্ঞতা নেই। সৃষ্টির অন্যান্য শাখার মতো এখানেও রবীন্দ্রনাথ কেবল অনন্য নন, এক বিস্ময়। (মোমেন ২০১০ : ভূমিকা) সতের বছর বয়সে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ প্রথম ভারতবর্ষের বাইরে ইউরোপে যান। সেই সতের বছর বয়স থেকে মৃত্যু অবধি তিনি ভ্রমণ করেছেন ৩০টিরও অধিক দেশ। এর মধ্যে কোনো কোনো দেশে গিয়েছেন একাধিকবার। আমেরিকায় পাঁচবার, জাপানে চারবার, ইউরোপে গিয়েছেন দুইবার। এছাড়া চীন, বার্মা (বর্তমানে মায়ানমার), সিংহল (বর্তমানে শ্রীলংকা), মালয় (বর্তমানে মালয়েশিয়া), ইরান, ইরাক প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেছেন। এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হয়েছে *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র* (১৮৮১), *য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি* (১৮৯৩), *জাপান-যাত্রী* (১৯১৯), *জাভা-যাত্রীর পত্র* (১৯২৭), *পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি* (১৯২৯), *রাশিয়ার চিঠি* (১৯৩০), *পারস্যে* (১৯৩৮), *পথের সঞ্চয়* (১৯৩৯) প্রভৃতি গ্রন্থে। অনুসন্ধিৎসু রবীন্দ্রনাথ অনুসন্ধানী ও দার্শনিক দৃষ্টি নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানা দেশ। প্রত্যক্ষ করেছেন প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, মানুষের জীবনচিত্র, নানা দেশ-জাতির বিচিত্র জীবনধারা, সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতির বর্ণবহুল নানা রূপ এবং তা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর রচিত ভ্রমণসাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ রচিত *জীবনস্মৃতি*, *ছেলেবেলা*, *ছিন্নপত্রাবলী*তেও স্থান পেয়েছে তাঁর ভ্রমণের নানা অভিজ্ঞতার চিত্র।

দুই

সূর্যোদয়ের দেশ জাপান। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের মানুষের কাছে আকর্ষণ এবং আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছিল অনন্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জাপানের সংস্কৃতি। চীন, কোরিয়া এবং ইউরোপের সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে জাপান গড়ে তুলেছে তার নিজস্ব সংস্কৃতি। জাপানিদের বিচিত্র জীবনধারা ও সংস্কৃতির টানেই প্রাচীনকাল হতে ভারতবর্ষ থেকে অনেক পর্যটক ভ্রমণ করেছেন জাপান। তবে জাপান-ভ্রমণ সম্পর্কিত প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন হরিপ্রভা তাকেদা নামক একজন বাঙালি নারী। বাংলাদেশের মেয়ে হরিপ্রভা মল্লিক ১৯০৬ সালে জাপানের নাগরিক উয়েমন তাকেদাকে বিয়ে করেন, তখন তাঁর নাম হয় হরিপ্রভা তাকেদা। বিয়ের ছয় বছর পর ১৯১২ সালে হরিপ্রভা তাঁর স্বামীর সঙ্গে জাপানে যান এবং প্রায় চার মাস জাপানে অবস্থান করেন। সেই সময়কালে জাপানের অভিজ্ঞতা নিয়ে রচিত *বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা*[১] ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে। এটিই বাংলা ভাষায় রচিত জাপান সম্পর্কিত প্রথম বই। এ-গ্রন্থে হরিপ্রভা তৎকালীন জাপানের সমাজ ও সংস্কৃতির নানা চিত্র উপস্থাপন করেছেন। হরিপ্রভার দৃষ্টিতে টোকিও শহরের বর্ণনা :

> টোকিও জাপানের রাজধানী। টোকিওতে বিশেষ বিশেষ কয়েকটী বাড়ী ব্যতীত সকলই কাঠের বাড়ী। সহরটী রাজধানী হিসাবে বিশেষ কিছু জমকাল ব'লে বোধ হয় না। রাস্তায় সর্ব্বদা রিক্সা, ট্রাম চলে, কদাচিৎ ঘোড়ার গাড়ী দেখা যায়। সহরের রাস্তাগুলি খুব বিস্তৃত। বৃষ্টির পর রাস্তার অবস্থা সর্ব্বত্রই সমান হয়। কাষ্ঠ-পাদুকা পরিয়া চলাতে আরও গভীর কাদা হয়। ট্রাম বেশ সুবিধাজনক, পাঁচ পয়সার এক টিকিটে সহরের যে কোন স্থানে যাওয়া যায়। ট্রাম বদলাইতে হইলেও এক টিকিটেই চলে। গাড়ী একখান করে চলে; শ্রেণীবিভাগ নাই। ট্রামের সম্মুখে ও পশ্চাদ্দিকে দ্বার।... জাপানে পুলিশের নিকট তরবারী থাকে। পুলিশ কোনরূপ অত্যাচার উৎপীড়ন না করিয়া শান্তিরক্ষা করে এবং সকলের সহিত শিষ্ট ব্যবহার করে। স্থানে স্থানে টেলিফোন করার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর আছে, পাঁচ পয়সা দিয়া টেলিফোনে পাঁচ মিনিট কথা বলা যায়। (হরিপ্রভা ১৯৯৯ : ৩৯)

টোকিও শহরের এই বিবরণ থেকে তৎকালীন জাপান সম্পর্কে স্পষ্ট একটি ধারণা পাওয়া যায়। হরিপ্রভার জাপান ভ্রমণের প্রায় চার বছর পরে ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রথমবারের মতো জাপান ভ্রমণে যান।

বাংলার নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্র কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে আধুনিক জাপানের সম্পর্ক অনেক আগে থেকেই। তাই স্বভাবতই জাপানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিলো এবং সেই আগ্রহের প্রকাশ দেখা যায় ১৯১৫ সালে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Visiting Scholar শ্রীকিমুরাকে যে পত্র লিখেন তাতে :

> I want to know Japan in the out-ward manifestation of its modern life in the spirit of its traditional past. I also want to follow the

> traces of ancient India in your civilization and have some idea of your literature if possible. (প্রশান্তকুমার ১৯৯৭ : ৬০)

মূলত জাপানি সাহিত্য সম্পর্কে জানা, জাপানের জাগরণের উৎস-সন্ধান এবং জাপানের সভ্যতায় ভারতীয় ঐতিহ্যের সন্ধান করতে রবীন্দ্রনাথ জাপান ভ্রমণে আগ্রহী ছিলেন।

তোসামারু[২] (Tosa-Maru) নামক জাপানি জাহাজে ১৯১৬ সালের ১লা মে রবীন্দ্রনাথ তিনজন ভ্রমণসঙ্গীসহ চড়ে বসেন। দুইদিন অপেক্ষার পরে ৩রা মে জাহাজটি জাপানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। যাত্রার শুরুতেই এই দুইদিনের অপেক্ষার বিষয়ে *জাপান-যাত্রী*র প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> বাড়ির লোকেরা সকলেই জাহাজে চড়িয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে গেল, বন্ধুরা ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিয়ে বিদায় দিলে, কিন্তু জাহাজ চলল না। অর্থাৎ যারা থাকবার তারাই গেল, আর যেটা চলবার সেটাই স্থির হয়ে রইল; বাড়ি গেল সরে, আর তরী রইল দাঁড়িয়ে। (*জাপান-যাত্রী* : ১)

যাত্রা শুরু করে আবার বসে থাকা যে কতোটা বিরক্তিকর, তা লেখকের এই কথাতেই স্পষ্ট। 'কেননা যাত্রা করবার মানেই মনের মধ্যে চলার বেগ সঞ্চয় করা। মন যখন চলবার মুখে তখন তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা, তার এক শক্তির সঙ্গে তার আর-এক শক্তির লড়াই বাধানো।' (*জাপান-যাত্রী* : ১) তোসামারু জাহাজে করে জাপান-যাত্রায় রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন ইংরেজ বন্ধু মি. পিয়ার্সন[৩], সি.এফ. অ্যান্ড্রুজ[৪] এবং কলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ চিত্রশিল্পী মুকুলচন্দ্র দে[৫]।

*জাপান-যাত্রী*র প্রায় প্রতিটি পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। পনেরোটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত ভ্রমণসাহিত্যটির বেশিরভাগ অংশই রচিত হয়েছে জাহাজে বসে। বিশ্বায়নের এই যুগে বিজ্ঞানের উন্নতিতে বেড়েছে কলকারখানার সংখ্যা। এই কলকারখানার কারণে মানুষ যেমন উপকৃত হচ্ছে, তেমনি পরিবেশ বিপর্যয়ের মূল কারণও এই শিল্পায়ন। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'দিনের বেলাটা মর্ত্যলোকের, আর রাত্রিবেলাটা সুরলোকের'। কিন্তু শিল্পায়ন-কলকারখানার কারণে বিপর্যয় ঘটছে পরিবেশের, আর তা দেবতাকেও ক্লিষ্ট করে তুলছে। কলকারখানায় দিবারাত্রি যে কর্মযজ্ঞ চলে, তাতে ঘুচে যাচ্ছে দিন ও রাতের ব্যবধান। অন্ধকার-নিস্তব্ধ রাত দেবতাদের জন্য। কিন্তু কলকারখানার কারণে নষ্ট হচ্ছে রাতের সেই নিস্তব্ধতা। তাছাড়া কলকারখানার উচ্ছিষ্ট নষ্ট করছে পরিবেশ। রবীন্দ্রনাথের মতে :

> ... মানুষের হাতে বন্দী হয়ে সমুদ্রও কলুষিত। জলের উপরে তেল ভাসছে, মানুষের আবর্জনাকে স্বয়ং সমুদ্রও বিলুপ্ত করতে পারছে না। সেই রাত্রে জাহাজের ডেকের উপর শুয়ে অসীম রাত্রিকেও যখন কলঙ্কিত দেখলুম তখন মনে হল, একদিন

> ইন্দ্রলোক দানবের আক্রমণে পীড়িত হয়ে ব্রহ্মার কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন — আজ মানবের অত্যাচার থেকে দেবতাদের কোন রুদ্ধ রক্ষা করবেন? (*জাপান-যাত্রী* : ১)

কলকারখানা বা যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতিতে বাণিজ্য হারিয়েছে তার সৌন্দর্য। তাই কলকারখানাগুলোকে রবীন্দ্রনাথ তুলনা করেছেন 'প্রথম যুগের দানব-জন্তু'র (ডাইনোসর) সঙ্গে। সেই 'দানব-জন্তু'রা যেমন পৃথিবীতে বেশিদিন টিকতে পারেনি, তেমনি বর্তমানকালের এই 'দানব-জন্তু'রাও অচিরেই বিদায় নেবে পৃথিবী থেকে। কারণ 'বাণিজ্য-দানবটা নিজের বিরূপতায়, নিজের প্রকাণ্ড ভারের মধ্যে নিজের প্রাণদণ্ড বহন করছে।' (*জাপান-যাত্রী* : ১১)

যাত্রা শুরুর পর জাহাজ প্রথমে থামে রেঙ্গুনে (বার্মা)। রেঙ্গুনে পৌছে রবীন্দ্রনাথ সেখানকার কর্মঠ নারীদের দেখে আপ্লুত হন। বার্মার পুরুষেরা অলস ও আরামপ্রিয় হওয়ার কারণে প্রায় বেশিরভাগ শারীরিক পরিশ্রমের কাজ নারীরাই করে থাকে। রবীন্দ্রনাথের মতে এই শারীরিক পরিশ্রমের কারণেই সেখানকার নারীদের সৌন্দর্য যেন আরও বেশি বিকশিত হয়ে উঠেছে। কর্মতৎপরতাই যে নারীদের যথার্থ শ্রী দেয়, তা লেখকের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। এই কর্মতৎপরতা যেমন ব্রহ্মদেশের নারীদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে, তেমনি তাদের মুক্তিও দিয়েছে পরাধীনতার বন্ধন থেকে :

> কেবল বাইরে বেরোতে পারাই যে মুক্তি তা নয়, অবাধে কাজ করতে পাওয়া মানুষের পক্ষে তার চেয়ে বড়ো মুক্তি। পরাধীনতাই সবচেয়ে বড়ো বন্ধন নয়, কাজের সংকীর্ণতাই হচ্ছে সবচেয়ে কঠোর খাঁচা। (*জাপান-যাত্রী* : ৪)

'জাহাজ থেকেই জাপানের স্বাদ' পাওয়া শুরু করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কারণ 'তোসামারু' নামক জাহাজটির ক্যাপ্টেন, নাবিক, শ্রমিক সবাই ছিলো জাপানি। তাদের কর্মতৎপরতা, শৃঙ্খলা, আচার-আচরণে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি : 'এদের দেখে আমার মনে হয়, এরা নূতনজাগ্রত জাতি, এরা সমস্তই নূতন করে জানতে, নূতন করে ভাবতে উৎসুক।' (*জাপান-যাত্রী* : ৮) জাপানিদের এই বৈশিষ্ট্যই আজ তাদেরকে আসীন করেছে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-অর্থনীতির সর্বোচ্চ শিখরে। প্রায় শত বছর পূর্বেই তা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

বার্মা, সিঙ্গাপুর, হংকংয়ের বন্দর পার হয়ে ১৬ই জৈষ্ঠ তারিখে রবীন্দ্রনাথ পৌছেন জাপানের কোবে বন্দরে। সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত হন বিখ্যাত জাপানি চিত্রকর টাইক্কন[৬], চিত্রকর কাট্‌স্‌টা[৭], শান্তিনিকেতনের জুজুৎসু ব্যায়ামের প্রশিক্ষক সানো, কাওয়াগুচি প্রমুখ বিখ্যাত জাপানি ব্যক্তিবর্গ। সবাই রবীন্দ্রনাথকে আতিথ্য দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি গুজরাটি বণিক মোরারাজির[৮] বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন।

তিন

জাপানে পৌঁছে সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি কাড়ে জাপানী নারীদের সৌন্দর্য ও জাপানের দাসীদের কর্মতৎপরতা। কবি-সাহিত্যিকগণ নারীদেহের যে সৌন্দর্যের বর্ণনা দেন তার সঙ্গে ঢের অনৈক্য থাকলেও জাপানি নারীদের সৌন্দর্য কম নয়। জাপানি দাসীদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন :

> যেন মানুষের সঙ্গে পুতুলের সঙ্গে, মাংসের সঙ্গে মোমের সঙ্গে মিলিয়ে একটা পদার্থ — আর, সমস্ত শরীরে ক্ষিপ্রতা, নৈপুণ্য, বলিষ্ঠতা। (*জাপান-যাত্রী* : ১২)

জাপানের প্রাচীন ঐতিহ্যের সন্ধান একমাত্র জাপানের মেয়েদের মধ্যেই দেখা যায়। জাপানের পুরুষেরা যেভাবে ইউরোপকে আত্মস্থ করেছে, সেই তুলনায় জাপানের মেয়েরা এখনও তাদের পোশাকে-চলাফেরায় রক্ষা করে চলেছে তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য। তাই 'এরাই জাপানের ঘর, জাপানের দেশ'।

জাপানের মানুষ শান্তিপ্রিয় ও শৃঙ্খলাপরায়ণ। তাই রাস্তা-ঘাটে লোকজনের ভিড় থাকলেও গোলমাল একেবারেই নেই। ঝগড়াঝাঁটি বা চিৎকার-চেঁচামেঁচি করে জাপানিরা তাদের বলক্ষয় করে না। তাই 'প্রাণশক্তির বাজে খরচ নেই বলে প্রয়োজনের সময় টানাটানি পড়ে না।' এ-কারণে আঘাত-উত্তেজনার সময় ওরা জানে কিভাবে নিজেকে সংযত করতে হয়। জাপানিদের হৃদয় সরোবরের জলের মতো স্তব্ধ, ঝর্ণার জলের মতো শব্দ করে না। জাপানিদের এই সহিষ্ণুতা, শান্তি ও সংযমের প্রকাশ তাদের সাহিত্যেও দেখা যায়।

জাপানের কবিতা 'ছবি দেখার কবিতা, গান গাওয়ার কবিতা নয়'। জাপানি কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত :

> এই যে নিজের প্রকাশকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করতে থাকা, এ ওদের কবিতাতেও দেখা যায়। তিন লাইনের কাব্য জগতের আর কোথাও নেই। এই তিন লাইনই ওদের কবি, পাঠক, উভয়ের পক্ষে যথেষ্ট। (*জাপান-যাত্রী* : ১৩)

জাপানের এই তিন লাইনের কবিতাকে বলা হয় 'হাইকু' (haiku)। *The Cassell Dictionary of Literary and Language Terms* গ্রন্থে হাইকুর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে নিম্নোক্তভাবে:

> a form of simple but imaginative Japanese verse that has seventeen syllables in three lines — five syllables in the first, seven in the second and five in the third. ... haiku are so short and cannot therefore include a lot of detail, a careful choice of words is crucial. But, in spite of being short, they can encompass much; on the surface they create a picture of one particular object or scene,

but the description is often suggestive of a mood or emotion. Here is an example by Kikaku :

[Full moon]
Bright the full moon shines;
on the matting on the floor,
shadowsof the pines.
(Christina and Marilyn, 1992 : 134)

প্রথম লাইনে ৫টি, দ্বিতীয় লাইনে ৭টি এবং শেষ লাইনে ৫টি – এই মোট ১৭টি সিলেবল নিয়ে গঠিত হাইকু পৃথিবীর সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত কবিতা। হাইকু মূলত ইন্দ্রিয় ও চিত্রকল্পপ্রধান কবিতা। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে প্রথম হাইকু লেখা শুরু হয়। মাতসুও বাশো (১৬৪৪ – ১৬৯৪), তানিগুচি বুশো (১৭১৫–১৭৮৩), ইস্সা (১৭৬২–১৮২৬) এবং শিকি (১৮৬৭–১৯০২) —এই চারজন হাইকু রচয়িতা হিসেবে সবচেয়ে বিখ্যাত। এর মধ্যে মাতসুও বাশো-কে বলা হয় হাইকুর প্রাণপুরুষ। 'হাইকুর নান্দনিকতার মূল ভিত্তি এর সংক্ষিপ্ততা। ... একটি ধারণা, ভাব, অনুভূতির অভিজ্ঞতা কম শব্দ দ্বারা প্রকাশ করার মধ্যেই রয়েছে এর সৌন্দর্য।' (হাসনাত, ২০১৪ : ১০৯) প্রকৃতি এবং ঋতুবৈচিত্র্যতা হাইকুর মূল বিষয়। প্রকৃতির বর্ণনায় ঋতুর উল্লেখ হাইকু লেখার অন্যতম শর্ত। *জাপান-যাত্রী*তে রবীন্দ্রনাথ হাইকু অনুবাদ করেছেন বাংলায় :

পচা ডাল,
একটা কাক,
শরৎকাল। (*জাপান-যাত্রী* : ১৩)

আরেকটি উদাহরণ :

পুরোনো পুকুর,
ব্যাঙের লাফ,
জলের শব্দ। (*জাপান-যাত্রী* : ১৩)

দুটি হাইকুতেই কবি একটি ছবির ইশারা দিলেন তিন লাইনের মধ্যে, এতেই পাঠকের মনে একটি পুরো চিত্র অঙ্কিত হয়ে গেলো। কবি কেবল একটি প্রকৃতির ছবির সূত্রপাত করেই সরে দাঁড়ান। এ কারণেই হাইকু 'ছবি দেখার কবিতা, গান গাওয়ার কবিতা নয়'। হাইকু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন :

> ... এই কবিতাগুলির মধ্যে কেবল যে বাক্সংযম তা নয়, এর মধ্যে ভাবের সংযম। এই ভাবের সংযমকে হৃদয়ের চাঞ্চল্য কোথাও ক্ষুব্ধ করছে না। আমাদের মনে হয় এইটেতে জাপানের একটা গভীর পরিচয় আছে। এক কথায় বলতে গেলে একে বলা যেতে পারে হৃদয়ের মিতব্যয়িতা। (জাপান-যাত্রী : ১৩)

জাপানিরা অপ্রয়োজনীয় কথা বলে বলক্ষয় করে না, তাদের এই হৃদয়ের মিতব্যয়িতার অন্যতম প্রকাশ তাদের 'হাইকু' কবিতা।

জাপানিদের সৌন্দর্যবোধ দেখে অবাক হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। জাপানের গরিব মানুষও প্রতিদিন ক্ষুধার পয়সা বাঁচিয়ে ফুল কেনে। ফুল জাপানিদের জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন : 'এদের চোখের ক্ষুধা এদের মনের ক্ষুধার চেয়ে কম নয়।' (*জাপান-যাত্রী* : ১৩) জাপানে রবীন্দ্রনাথ শিখেছেন 'ফুল সাজানোর বিদ্যা'; যা পরিচিত 'ইকেবানা' নামে। প্রাচীনকাল থেকেই প্রাচ্যের দেশগুলোতে 'ইকেবানা' বা 'ফুল সাজানোর বিদ্যা' সংস্কৃতির অংশ হয়ে আছে। এমনকি প্রাচীন বিখ্যাত যোদ্ধারা রণদক্ষতা ও বীরত্বের উন্নতির জন্য অবসর সময়ে ফুল সাজানোর বিদ্যার আলোচনা করতো। 'ইকেবানা'কে জাপানিরা শৌখিন জিনিস বলে মনে করে না —ওরা বিশ্বাস করে এতে মানুষের মন শান্ত হয়, আর গভীরভাবে এতে মানুষের শক্তিবৃদ্ধি হয়। ইকেবানা সম্পর্কে একজন সমালোচক বলেন :

> প্রাচ্য দেশের দর্শন ও ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একাত্মতাবোধ। প্রাচ্য দেশের মানুষ প্রকৃতির গাছপালা, ফুল-পাতা, পাখি ও জন্তুর সংস্পর্শে বাস করে এবং এই পটভূমির সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে থাকে। জাপানিদের কাছে ফুলের বিন্যাস ও অলঙ্করণ তাদের প্রকৃতিমুখী জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাদের কাছে ইকেবানা প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে মানুষের নিত্যদিনের অভ্যাসের সামঞ্জস্য সাধন করে। (হাসনাত ২০১৪ : ২৫৩)

ইকেবানার অর্থ গাছের কেটে আনা ডালপালা ও ফুলের ভেতর প্রাণ আরোপ করা। তাছাড়া ইকেবানায় ঐতিহ্যগতভাবে ব্যবহৃত তিনটি ডাল, কয়েকটি ফুল ও অন্যান্য বস্তু মূলত স্বর্গ, মর্ত্য এবং মানুষের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকেই জাপানে ফুল সাজানোর বিভিন্ন পদ্ধতি একটি বিশেষ রূপকাত্মক শিল্পের স্তরে উন্নীত হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, ওনো-নো-ইমোকো নামক একজন জাপানির মাধ্যমে ফুল সাজানোর এই শিল্প জাপানে বিস্তৃত হয়। জাপানের প্রাচীনতম ফুল-সাজানোর শৈলী 'ইকোনোবাও'-এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন এই ওনো-নো-ইমোকো। এই শৈলিকে প্রচলিত জাপানি ভাষায় বলা হতো 'তাতেবানা' বা 'দণ্ডায়মান পুষ্পস্তবক'। পরবর্তীকালে পঞ্চদশ শতাব্দীতে 'রিক্কা' (অর্থ দণ্ডায়মান পুষ্পস্তবক) শৈলির সৃষ্টি হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে 'রিক্কা' শৈলী হতে জন্ম হয় 'শোওকা' শৈলীর। তবে প্রতিটি শৈলীর প্রত্যেকটিতেই পুষ্পবিন্যাস সম্পাদন করা হয় তিনটি শাখার দ্বারা এবং নতুন নতুন পরিভাষার দ্বারা শাখাগুলিকে সনাক্ত করা হয়। যেমন, 'তেন' বা স্বর্গ, 'জিন্' বা মানুষ এবং 'চি' বা পৃথিবী। 'স্বর্গ-মত্য্য-মানুষ' নামক ত্রিভুজ বিন্যাস 'চৌয়া' সূত্রের ভিত্তিতে তৈরি করা হয় ইকেবানায়। ইকেবানার মাধ্যমে জাপানের সৌন্দর্যবোধ সম্বন্ধে বাইরের পৃথিবী অবহিত হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথও মুগ্ধ হয়েছিলেন ফুল সাজানোর এই বিদ্যা দেখে।

জাপানি সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে চা-পানের অনুষ্ঠান। জাপানিদের চা-পানের অনুষ্ঠান ধর্মানুষ্ঠানের তুল্য। একজন ধনী জাপানির বাড়িতে

চা-পান অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে পরিচিত হন। চা-পানের এই অনুষ্ঠানকে জাপানি ভাষায় বলা হয় 'চ্যানোয়ু'। 'চ্যানোয়ু' শব্দের অর্থ গরম পানি। এই অনুষ্ঠানটি একই সঙ্গে ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় বহন করে। চা-পানের এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ফুলের বিন্যাস বা ফুল সাজানোর বিদ্যা (ইকেবানা), স্থাপত্য শিল্প, উদ্যান শিল্প, মৃৎশিল্প এবং ক্যালিগ্রাফিসহ আরও অনেক কিছু। চা-পানের এই অনুষ্ঠান নিয়ে লেখা হয়েছে অনেক বই। কাকুজু ওকাকুরা'র *The Book of Tea*, এ.এল. স্যাডলারের *Cha-No-Yu : The Japanese Tea Ceremony* এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। *Japanese Things* নামক গ্রন্থে 'চ্যানোয়ু' সম্পর্কে বলা আছে :

> Few things have excited more interest among collectors of Japanese curias than the 'Cha-no-yu', or tea ceremonies, of which so many of the highly prized little "Japanesities" in their collections are in one way or another the implements. And as quarrelling with other collectors is part of every true collector's nature, so also has the battle raged round the Japanese tea-table, — a veritable and literal storm in a tea-cup. (Chamberlain 1973 : 455)

জাপানি বৌদ্ধশ্রমণ এইসাই (১১৪১-১২১৫) চা-পান সংক্রান্ত বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় আচারের এই আনুষ্ঠানিক রূপটিকে চীনদেশ থেকে জাপানে প্রবর্তন করেন। কালক্রমে জাপানে চা-পানের বিভিন্ন শৈলীর প্রচলন হয়। এর মধ্যে দুটি ধারাকে প্রধান ধারা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় :

ক. সাধারণ মানুষের চা-অনুষ্ঠান বা 'উরা সেন্‌কে' এবং

খ. অভিজাত মানুষের চা-অনুষ্ঠান বা 'ওমোতে সেন্‌কে'।

রবীন্দ্রনাথ যে চা-পানের অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়েছেন তা ছিলো 'ওমোতে সেন্‌কে' ধারার চা-পানের অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুরুতেই একটি বাগানে প্রবেশ করেন রবীন্দ্রনাথ। যে বাগান 'ছায়াতে সৌন্দর্য এবং শান্তিতে একেবারে নিবিড়ভাবে পূর্ণ'। তারপর বাগানের এক জায়গায় গাছের তলায় গর্ত করা পাথরের মধ্যে জমা করা স্বচ্ছ জল দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে একটি ছোট ঘরে প্রবেশ করতে হয়। নিয়ম হচ্ছে এই ছোট ঘরে কিছু সময় নীরব হয়ে বসে থাকতে হবে। ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই গৃহস্বামীর সঙ্গে দেখা হয় না। তারপর আরও কয়েকটা ঘরে কিছু সময় ধরে বিশ্রাম করতে করতে আসল ঘরে যেখানে নিমন্ত্রণের আয়োজন সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। 'সমস্ত ঘরই নিস্তব্ধ, যেন চিরপ্রদোষের ছায়াবৃত; কারও মুখে কথা নেই। মনের উপর এই ছায়াঘন নিঃশব্দ নিস্তব্ধতার সম্মোহন ঘনিয়ে উঠতে থাকে। অবশেষে ধীরে ধীরে গৃহস্বামী এসে নমস্কারের দ্বারা আমাদের অভ্যর্থনা করলেন।' (*জাপান-যাত্রী* : ১৩)

অবশেষে গৃহস্বামীর মেয়ে এসে চা-পরিবেশনের দায়িত্ব নেন। চা-পরিবেশেনার এই অংশটির বিবরণ রবীন্দ্রনাথের জবানিতেই শোনা যাক :

> তাঁর [গৃহস্বামীর মেয়ের] প্রবেশ থেকে আরম্ভ করে চা-তৈরির প্রত্যেক অঙ্গ যেন ছন্দের মতো। ধোয়া মোছা, আগুন জ্বালা, চাদানির ঢাকা খোলা, গরম জলের পাত্র নামানো, পেয়ালায় চা ঢালা, অতিথির সম্মুখে এগিয়ে দেওয়া, সমস্ত এমন সংযম এবং সৌন্দর্যে মণ্ডিত যে সে না দেখলে বোঝা যায় না। এই চা পানের প্রত্যেক আসবাবটি দুর্লভ ও সুন্দর। অতিথির কর্তব্য হচ্ছে, এই পাত্রগুলিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একান্ত মনোযোগ দিয়ে দেখা। প্রত্যেক পাত্রের স্বতন্ত্র নাম এবং ইতিহাস। কত যে তার যত্ন, সে বলা যায় না। (*জাপান-যাত্রী* : ১৩)

চা-তৈরির পাত্রগুলোকে বলা হয় 'দোগু', যা নির্ধারিত হয় বছর, ঋতু এবং দিন-রাত্রির যে সময় চা তৈরি হবে তার ওপর। চ্যানোয়ুতে সাধারণত অতিথিদের সংখ্যা হয়ে থাকে চারজন। এক ধরনের ধ্যান ও সাধনাই হলো এই চা-পানের অনুষ্ঠান। শরীর ও মনকে একান্ত সংযত করে প্রকৃতির এবং সৌন্দর্যের গভীরতার মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করাই এই চা-পানের অনুষ্ঠানের মূল তাৎপর্য।

চার

জাপানের ঘরবাড়ির যে বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তাতে দেখা যায় তাদের ঘরে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত কোন আসবাবপত্র নেই। 'ঘরগুলিতে আসবাব নেই বললেই হয়, অথচ মনে হয় যেন এ-সমস্ত ঘর কী একটাতে পূর্ণ, গমগম করছে।' (*জাপান-যাত্রী*: ১৩) বসার ঘরে আসবাবের বাহুল্য তো নেইই, দেখা যায় দেয়ালে হয়তো একটিমাত্র ছবি ঝুলছে। অতিথিরা সে ছবি দেখেই তৃপ্ত হন, কারণ 'যে ছবি যথার্থ সুন্দর তার চারি দিকে মস্ত একটি বিরলতার অবকাশ থাকা চাই'। জাপানিদের কাছে যা কিছু সুন্দর, রমনীয় তা তারা দেখে অল্প করে, বেশি পরিমাণে ছবি টানিয়ে দেয়াল ভরে ফেলে না এবং গৃহসজ্জা করতে গিয়েও ঘরের মধ্যে বেশি আসবাব রাখে না। কারণ 'ভালো জিনিসগুলোকে ঘেঁষাঘেঁষি করে রাখা তাদের অপমান করা — সে যেন সতী স্ত্রীকে সতিনের ঘর করতে দেওয়ার মতো।' জাপানিরা জানে অল্প করে না দেখলে কোনো কিছু পূর্ণ করে বা পরিপূর্ণভাবে দেখা হয় না। বাড়ি তৈরি করার সময় দেয়াল, কড়ি, বরগা, জানালা, দরোজা যতদূর পরিমিত করা যায়, তারা সেভাবেই তা তৈরি করে। ঘরের মধ্যে প্রয়োজন ব্যতীত কোনো আসবাব রাখা হয় না, আর যারা সাবেকি চালের তারা ঘরে চৌকি, টেবিল একদম ব্যবহার করে না। অতিথি এলে ঘরের মেঝেতেই বসে। তাদের আসবাবের এই রিক্ততা যেন পূর্ণতার জন্যই; কারণ 'পূর্ণতার জন্যে রিক্ততা সবচেয়ে দরকারি।'

নারী-পুরুষের সম্পর্ক, চালচলনের ক্ষেত্রে যে ব্যবধান অন্যান্য দেশে দেখা যায় জাপানে তা একেবারেই নেই। নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে লজ্জা-সংকোচের

আবিলতা নেই, কারণ জাপানিদের মোহের প্রতি আকর্ষণ কম। নারী-পুরুষের দেহ সম্পর্কে উভয় পক্ষের মন খুব স্বাভাবিক এবং পরস্পরের দৃষ্টিতে কোনো মায়া-মোহকে পালন করে না। তাই জাপানের গ্রামাঞ্চলে এখনও নারী-পুরুষের একসঙ্গে বিবস্ত্র হয়ে স্নান করার প্রথা আছে এবং এই প্রথার মধ্যে কোন ধরনের কলুষতা নেই। রবীন্দ্রনাথের মতে:

> পৃথিবীতে যত সভ্য দেশ আছে তার মধ্যে কেবল জাপান মানুষের দেহ সম্বন্ধে যে মোহমুক্ত, এটা আমার কাছে খুব একটা বড়ো জিনিস বলে মনে হয়। (*জাপান-যাত্রী* : ১৩)

তাই জাপানের চিত্রশিল্পে যেমন উলঙ্গ নারীমূর্তি দেখা যায় না, তেমনি নারীদের পরিধেয় পোশাক-আশাকের মধ্যে নিজেকে নারী বলে পরিচয় দেয়ার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই এবং মেয়েদের বেশ-ভুষার মধ্যে এমন কিছু ভঙ্গি থাকে যাতে বোঝা যায় তারা বিশেষভাবে দাবি রেখেছে পুরুষদের মোহদৃষ্টির প্রতি।

জাপানের রাস্তাঘাটে প্রচুর ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে দেখা যায়। এতো ছোটো ছোটো শিশু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের আর কোথাও দেখেননি। জাপানিরা ফুলকে যে কারণে ভালোবাসে ঠিক সে কারণেই শিশুদের ভালোবাসে। কারণ শিশুদের ভালোবাসায় কোনো কৃত্রিমতা নেই, মোহ নেই। তাই শিশুদেরকে ফুলের মতোই নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসা যায়। তাছাড়া জাপানের বড়োরা যেমন আজেবাজে চেঁচামেচি করে শক্তির বাজে খরচ করে না, তেমনি শিশুরাও যেন কাঁদতে জানে না। জাপানে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কোন শিশুকেই কাঁদতে দেখেননি।

জাপানি নাচ রবীন্দ্রনাথের মতে 'দেহভঙ্গির সংগীত'। আমাদের দেশের বীণার আলাপের মতো, যার পদে পদে মীড়। লেখকের মতে :

> খাঁটি য়ুরোপীয় নাচ অর্ধনারীশ্বরের মতো – আধখানা ব্যায়াম, আধখানা নাচ; তার মধ্যে লম্ফঝম্প, ঘুরপাক, আকাশকে লক্ষ্য করে লাথি-ছোঁড়াছুঁড়ি আছে। জাপানি নাচ একেবারে পরিপূর্ণ নাচ। তার সজ্জার মধ্যেও লেশমাত্র উলঙ্গতা নেই। (*জাপান-যাত্রী* : ১৪)

অন্য দেশের নাচে যেমন দেহের সৌন্দর্যলীলার সঙ্গে লালসা মিশ্রিত থাকে, দেহের অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে দেহ-প্রদর্শনী থাকে, জাপানি নাচে তার ছিটোফোঁটাও নেই। জাপানিরা নাচকে শুধুমাত্র নাচ হিসেবেই দেখে, তাদের সৌন্দর্যপ্রিয়তার মধ্যে তাই দেহলালসার মিশ্রণের প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু জাপানে দৃশ্যকলা ও নৃত্যকলার যতোটুকু উৎকর্ষ ঘটেছে, রবীন্দ্রনাথের মতে তাদের সংগীত সে তুলনায় এগোয়নি। নৃত্যকলার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হচ্ছে

দর্শনেন্দ্রিয়ের, কিন্তু সংগীত শ্রুতিনির্ভর। তাই চোখ আর কান, এই দুইয়ের উৎকর্ষ একসঙ্গে ঘটে না। চিত্রকলা এবং সংগীতের প্রকরণগত তারতম্য বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> ছবি জিনিসটা হচ্ছে অবনীর, গান জিনিসটা গগনের। অসীম সেখানে সীমার মধ্যে সেখানে ছবি; অসীম যেখানে সীমাহীনতায় সেখানে গান। রূপরাজ্যের কলা ছবি, অপরূপরাজ্যের কলা গান। কবিতা উভচর, ছবির মধ্যেও চলে, গানের মধ্যেও ওড়ে। কেননা, কবিতার উপকরণ হচ্ছে ভাষা। ভাষার একটা দিকে অর্থ, আর-একটা দিকে সুর; এই অর্থের যোগে ছবি গড়ে ওঠে, সুরের যোগে গান। (*জাপান-যাত্রী* : ১৪)

জাপানের ট্র্যাডিশনাল বা ঐতিহ্যবাহী সংগীতকে সময়ের নিরিখে ভাগ করা যায় পাঁচ ভাগে। প্রাচীনকালের প্রাথমিক পর্ব হচ্ছে দেশীয় সঙ্গীতের কাল, প্রাচীনকালের দ্বিতীয় পর্ব আন্তর্জাতিক সংগীতের কাল, মধ্যযুগের প্রাথমিক পর্ব জাতীয় সংগীতের কাল(১), মধ্যযুগের দ্বিতীয় পর্ব জাতীয় সংগীতের কাল(২) এবং আধুনিক পর্ব হচ্ছে বিশ্বসংগীতের কাল। মূলত খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে বিশ শতক পর্যন্ত সময়কালকে এই পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। জাপানের ট্র্যাডিশনাল সংগীত মূলত নয় ধরনের : 'গাগাকু' (মার্জিত সংগীত), 'শোমইয়ো' (বৌদ্ধধর্মের মন্ত্রোচ্চারণ-ভিত্তিক সংগীত), 'বিওয়া' সংগীত, 'নো' সংগীত (নাট্যশিল্প হিসেবে পরিচিত এবং জাপানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ট্র্যাডিশনাল সংগীত বলে মনে করা হয়), 'কোটো' সংগীত (জাপানের বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র, যা বিশুদ্ধ সংগীতের স্বর সৃষ্টি করে), 'কাবুকি' এবং 'বুনরাকু', 'সামিসেন', 'সাকুহাচি' এবং লোকসংগীত ও লোকগান ইত্যাদি।

জাপানের শিল্পকলার বিপ্লবকে রবীন্দ্রনাথ তাদের নিজস্ব সাধনার ফসল হিসেবে অভিহিত করেছেন। য়োকোয়ামা টাইক্কান এবং তান্‌জান্‌ শিমোমুরা[৯] আধুনিক জাপানের শ্রেষ্ঠ এই দুই শিল্পী প্রথার বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছেন জাপানের চিত্রশিল্পকে। তাঁরা প্রাচীন জাপানের শিল্পের যেমন অনুকরণ করেন না, তেমনি আধুনিক ইউরোপেরও নকল করেন না। য়োকোয়ামা টাইক্কানের আঁকা একটি ছবি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা :

> একটি ছবি — পটের উচ্চপ্রান্তে একখানি পূর্ণচাঁদ, মাঝখানে একটি নৌকা, নীচের প্রান্তে দুটো দেওদার গাছের ডাল দেখা যাচ্ছে; আর কিছু না, জলের কোনো রেখা পর্যন্ত নেই। জ্যোৎস্নার আলোয় স্থির জল কেবলমাত্র বিস্তীর্ণ শুভ্রতা — এটা যে জল সে কেবল-মাত্র ওই নৌকাটি আছে বলেই বোঝা যাচ্ছে; আর, এই সর্বব্যাপী বিপুল জ্যোৎস্নাকে ফলিয়ে তোলবার জন্যে যত-কিছু কালিমা সে কেবলই ওই দুটো পাইন গাছের ডালে। ওস্তাদ এমন একটা জিনিসকে আঁকতে চেয়েছেন যার রূপ নেই, যা বৃহৎ এবং নিস্তব্ধ — জ্যোৎস্নারাত্রি —অতলস্পর্শ তার নিঃশব্দতা। (*জাপান-যাত্রী* : ১৪)

টাইক্কানের এই ছবিতে জ্যোৎস্নারাতের যে চিত্র ফুটে উঠেছে, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে তা এক কথায় অসাধারণ। জ্যোৎস্নারাত্রির নিস্তব্ধতা-নিঃশব্দতা এবং রূপ-কায়াহীন একটি ছবি তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলা সবার পক্ষে সম্ভবপর নয়। টাইক্কানের মতো তান্‌জান্‌ শিমোমুরার ছবিরও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। জাপানি চিত্রশিল্পের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য বাহুল্যহীনতা এবং সংযম। আধুনিক যুগের আগে জাপানের চিত্রকলা বিবর্তিত হয়েছে মূলত চীন এবং স্বদেশের বিষয় ও শৈলির মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে। দীর্ঘকাল ধরে পাশ্চাত্যের নানা শিল্প আন্দোলনে অংশ নিচ্ছেন জাপানের চিত্রশিল্পীরা; এবং তাঁরাই এগিয়ে নিয়ে গেছেন জাপানের আধুনিক চিত্রকলাকে। জাপানের শিল্পকলার এই উত্থানকে, চিত্রশিল্পের এই অগ্রগতি থেকে শিক্ষা লাভ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের শিল্পীদের। জাপানের শিল্পকলাকে নকল না করে তাদের উত্থানের পেছনের যে সাধনা-সংযম-ভক্তি লুকায়িত আছে তা থেকে আমাদের দেশের শিল্পীদের অনেক কিছু শেখার আছে। রবীন্দ্রনাথের মতে :

> শিল্প জিনিসটা যে কত বড়ো জিনিস, সমস্ত জাতির সেটা যে কত বড়ো সম্পদ, কেবলমাত্র শৌখিনতাকে সে যে কতদূর পর্যন্ত ছাড়িয়ে গেছে — তার মধ্যে জ্ঞানীর জ্ঞান, ভক্তের ভক্তি, রসিকের রসবোধ যে কত গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছে, তা এখানে এলে তবে স্পষ্ট বোঝা যায়। (*জাপান-যাত্রী* : ১৪)

গভীর সংযম, রসবোধ এবং শৌখিনতাই জাপানের শিল্পকলাকে উন্নীত করেছে এক অনন্য চূড়ায়। তাছাড়া জাপানের মানুষের জীবনযাত্রার অনেক উপকরণ থেকেও আমাদের দেশের মানুষের অনেক কিছু শেখার আছে বলেও মন্তব্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ইউরোপের তুলনায় আমরা যদি জাপানকে বেশি অনুকরণ করি তবেই আমাদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি উন্নত হবে; সংযম, শুদ্ধতা, ভক্তিভাব প্রবল হবে। লেখকের মতে, 'জাপানকে যদি দেখতে পেতুম তাহলে আমাদের ঘর থেকে অনেক কুশ্রীতা অশুচিতা অব্যবস্থা অসংযম আজ দূরে চলে যেত'।

পাঁচ

ইউরোপের সর্বজয়ী হয়ে ওঠার রহস্য এশিয়ার মধ্যে জাপানই প্রথম বুঝতে পারে এবং উপলব্ধি করে যে শক্তির কারণে ইউরোপের এই সর্বজয়ী রূপ, ইউরোপকে ঠেকাতে হলে সেই শক্তিকেই আয়ত্ত করতে হবে। তা না হলে ইউরোপের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হবে এবং একবার ছিটকে পড়লে উঠে দাঁড়ানো অসম্ভব হবে। জাপান এ-বিষয়টি উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গেই এক মুহূর্ত দেরি না করে ঝাঁপিয়ে পড়লো কর্মযজ্ঞে। তার ফলস্বরূপ :

> কয়েক বৎসরের মধ্যেই য়ুরোপের শক্তিকে আত্মসাৎ করে নিলে। য়ুরোপের কামান-বন্দুক কুচ-কাওয়াজ কল-কারখানা আপিস-আদালত আইন-কানুন যেন কোন্

> আলাদীনের প্রদীপের জাদুতে পশ্চিমলোক থেকে পূর্বলোকে একেবারে আস্ত উপড়ে এনে বসিয়ে দিলে। নতুন শিক্ষাকে ক্রমে ক্রমে সইয়ে নেওয়া, বাড়িয়ে তোলা নয়, তাকে ছেলের মতো শৈশব থেকে যৌবনে মানুষ করে তোলা নয় — তাকে জামাইয়ের মতো একেবারে পূর্ণ যৌবনে ঘরের মধ্যে বরণ করে নেওয়া। (*জাপান-যাত্রী* : ১৫)

ইউরোপের শিক্ষা-সংস্কৃতি-প্রযুক্তিকে জাপান এভাবে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আত্মস্থ করে নেয়। শুরুর দিকে জাপান ইউরোপ থেকে শিক্ষকের দল ভাড়া করে এনেছিল, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে নিজেরাই হাল ধরেছে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা উন্নয়নের। এ-রকম আশ্চর্যজনক ঘটনা সারা বিশ্বে কখনোই দেখা যায়নি। ইউরোপের উন্নয়নের এই ধারা জাপানিরা আত্মস্থ করতে পেরেছে শুধুমাত্র মনের জোরে। তারা যখনই বুঝতে পেরেছে ইউরোপকে ঠেকাতে হলে তাদেরই মতো করে শিক্ষা-প্রযুক্তিতে উন্নতি করতে হবে, তখনই তারা কাজে নেমে পড়েছে। মূলত 'জঙ্গম' মানসিকতার কারণেই জাপানিদের পক্ষে এতো সহজে ইউরোপের শক্তিকে আত্মস্থ করাসম্ভবপর হয়েছে।

জাপানিরা খাস মঙ্গোলীয় নয়, মিশ্র জাতি। তাদের মধ্যে আর্যরক্তেরও মিশ্রণ আছে। তাই ভারতীয় এবং মঙ্গোলীয় – এই দুই জাতির মানুষের সঙ্গে জাপানিদের অনেক মিল দেখতে পাওয়া যায়। বর্ণসংকরতার কারণে জাপানি জাতির মন একই ছাঁচে ঢালাই করা নয় – বৈচিত্র্যময়, চলনশীল। এই বৈশিষ্ট্য একটি জাতিকে অগ্রসর করতে সাহায্য করে। পৃথিবীর অনেক জাতিই নিজেদের রক্তের অবিমিশ্রতা নিয়ে গর্ব করে, কিন্তু জাপানিদের মধ্যে তা দেখা যায় না। তারা যে অবিমিশ্র কোনো জাতি নয় তা তারা সহজেই স্বীকার করে এবং প্রকাশ করতেও কুণ্ঠিত নয়। জাপানিদের সঙ্গে ভারতীয়দের যে রক্তের সম্পর্কে রয়েছে, এটা তারা লুকোনোর চেষ্টা করে না। এমনকি জাপানের চিত্রকলা যে ভারতবর্ষের কাছে নানাভাবে ঋণী, তা তারা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয় না। রবীন্দ্রনাথের মতে :

> বস্তুত, ঋণ তারাই গোপন করতে চেষ্টা করে ঋণ যাদের হাতে ঋণই রয়ে গেছে, ধন হয়ে ওঠেনি। ভারতের কাছ থেকে জাপান যদি কিছু নিয়ে থাকে সেটা সম্পূর্ণ তার আপন সম্পত্তি হয়েছে। যে জাতির মনের মধ্যে চলন-ধর্ম প্রবল সেই জাতিই পরের সম্পদকে নিজের সম্পদ করে নিতে পারে। (*জাপান-যাত্রী* : ১৫)

তাই ইউরোপের কাছ থেকে নেয়া শিক্ষা-প্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞান, ভারতবর্ষ ও চীনের কাছ থেকে নেয়া চিত্রকলাবিষয়ক জ্ঞানের ঋণ সহজেই তারা স্বীকার করে। এই ঋণ স্বীকার করেই জাপান আজ শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতির চরম শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছে।

ইউরোপের কাছ থেকে জাপান গ্রহণ করেছে 'কর্মের দীক্ষা', 'অস্ত্রের দীক্ষা' এবং 'বিজ্ঞানের শিক্ষা'। কিন্তু ইউরোপের সঙ্গে জাপানের অন্তরতর জায়গায় রয়েছে নানা

অনৈক্য। ইউরোপের মহত্ত্বের যে গূঢ় ভিত্তি তা হচ্ছে 'আধ্যাত্মিকতা'; শুধু কর্ম-নৈপুণ্য নয়, নৈতিক আদর্শ। জাপানের সঙ্গে ইউরোপের পার্থক্য এখানেই। 'স্বদেশ-প্রেম' বা 'স্বাদেশিক স্বার্থ'ই জাপানের কর্মনৈপুণ্যের তথা উন্নতির মূলমন্ত্র। ইউরোপকে অনুকরণ করতে গিয়ে জাপান একসময় চিন্তা করেছিলো যে ইউরোপের প্রধান যে ধর্ম তথা খ্রিস্টধর্ম, সেই ধর্মকে তারা গ্রহণ করবে কি না। তাদের চিন্তা ছিলো হয়তো এই ধর্মের কারণেই ইউরোপ শৌর্য-বীর্যে উন্নতির শীর্ষে অবস্থান করছে। কিন্তু আধুনিক ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিলো যে, 'খ্রিষ্টান-ধর্ম স্বভাবদুর্বলের ধর্ম, তা বীরের ধর্ম নয়।' এবং ইউরোপ এটা বলতে শুরু করেছিলো 'সংসারে যারা পরাজিত সে ধর্মে তাদেরই সুবিধা; সংসারে যারা জয়শীল সে ধর্মে তাদের বাধা'। জাপানিরা এই কথাটিকেই মেনে নিয়েছে। তাই তারা বিশ্বের প্রধানতম ধর্মগুলোকে প্রাধান্য না দিয়ে বেছে নিয়েছে এমন একটি ধর্মকে, যে ধর্ম তাদের রাজাকে এবং পূর্বপুরুষদেরকে মান্য করে দেবতা হিসেবে। এই ধর্মের নাম 'শিন্তো ধর্ম'। এই ধর্ম আধ্যাত্মিকতামূলক নয়, সংস্কারমূলক। এই ধর্মপালন তথা ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রেও জাপানিদের স্বাদেশিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে জাপান গ্রহণ করেছে বৌদ্ধধর্মকে। একজন সমালোচক বলেন :

> জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে জাপানিরা ধ্যানের অভ্যাসকে আয়ত্ত করেছে। অবশ্য এই ধ্যানের সঙ্গে ধর্মের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। কিন্তু মনঃসংযোগ, ধৈর্য ও বুদ্ধিশক্তিকে সূচালো করতে ধ্যানের উপযোগিতা জাপানে সবাই স্বীকার করে। ধ্যানই যেন জাপানিদের জীবনচর্যা, ধ্যানের মধ্যদিয়েই তারা সমস্ত কিছুকে আয়ত্ত করতে চায়। (সন্তোষকুমার ২০০৩ : ১৩৩)

দেবতা পুজার সঙ্গে জাপানিদের ধ্যানের সংযোগ নেই। কারণ জাপানের সবাই স্বীকার করে যে, 'মনকে স্তব্ধ করা, অবহিত করা, ধৈর্য ও বুদ্ধিশক্তিকে দৃঢ় করার' ক্ষেত্রে ধ্যানের উপযোগিতা অপরিসীম। জাপানের সকলেরই ধ্যানের সাধনা সম্পর্কে জানা আছে। তাই তাদের সকল কর্মকাণ্ডের মধ্যে যে সংযম, ধৈর্য এবং মিতচারিতা দেখা যায় তার উৎস হচ্ছে ধ্যানের এই সাধনা।

জাপানের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হচ্ছে আত্মনিবেদনের প্রকাশ, অহংকারের প্রকাশ নয়। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে জাপানিদের অহংকারের প্রকাশ দেখে মর্মপীড়া অনুভব করেছেন জাপানযাত্রী রবীন্দ্রনাথ। চীনের সঙ্গে জাপানের যে নৌযুদ্ধ[১০] হয়েছিলো, সেই যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলো জাপান। যুদ্ধজয়ের সেই স্মারকগুলোকে জাপানের নানা অঞ্চলে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতে যুদ্ধের বিভীষিকার স্মৃতি এভাবে প্রদর্শনের জন্য ছড়িয়ে রাখা একধরনের বর্বরতা, অহংকারের প্রকাশ এবং শান্তিপ্রিয় জাপানিদের ক্ষেত্রে যা বেমানান-অসুন্দর। লেখকের মতে :

> প্রয়োজনের খাতিরে অনেক ক্রুর কর্ম মানুষকে করতে হয়, কিন্তু সেগুলোকে ভুলতে পারাই মনুষ্যত্ব। মানুষের যা চিরস্মরণীয়, যার জন্যে মানুষ মন্দির করে, মঠ করে, সে তো হিংসা নয়। (*জাপান-যাত্রী* : ১৪)

জাপানের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি তথা সার্বিক বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা করলেও একমাত্র এই একটি বিষয় নিয়ে জাপানিদের সমালোচনা করেছেন তিনি। জাপানিদের এই কর্মকাণ্ড তাঁকে যেমন কষ্ট দিয়েছে তেমনি তিনি বিস্মিতও হয়েছেন। কারণ জাপানিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তা মানানসই নয়।

প্রায় তিনমাস জাপানে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন জাপানিদের জীবনাচারণ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্মীয় কার্যকলাপ, চিত্রকলা প্রভৃতি। পাশাপাশি জাপানের নানা জায়গায় বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতাও দেন। বক্তৃতার বিষয়গুলি ছিলো : India and Japan, The Nation, The Spirit of Japan এবং The Message of India to Japan. প্রতিটি ভাষণেই তিনি জাপানের বিভিন্ন বিষয়ের প্রশংসার পাশাপাশি জাপানের অনেক বিষয়ের সমালোচনাও করেছেন। এজন্য তাঁকে জাপান সরকারের বিরাগভাজনও হতে হয়েছে। ভাষণে তিনি জাপানসহ অন্যান্য আগ্রাসী-জাতীয়তাবাদী দেশগুলোর সমালোচনা করে যুদ্ধের কুফল ও অমানবিকতাকে তুলে ধরেছেন। প্রত্যাশা করেছেন দেশগুলি তাদের আগ্রাসী মনোভাব পরিহার করে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে। তাছাড়া আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে জাপানের অগ্রগতির প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র এশিয়ার পক্ষ থেকে জাপানকে অভিনন্দিত করেন। জাপানের অগ্রগতিকে সমগ্র এশিয়ার সম্মান বৃদ্ধির সঙ্গে তুলনা করেছেন। জাপানে প্রদত্ত একটি ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> One morning the whole world looked up in surprise, when Japan broke through her walls of old habits in a night and came out triumphant ... Japan, the child of the Ancient East, has also fearlessly claimed all the gifts of modern age for herself ... she has come in contact with the living time and has accepted with an amazing eagerness and aptitude the responsibilities of modern civilization. (*জাপান-যাত্রী*; গ্রন্থপরিচয় : ১৬৪)

প্রাচ্য তথা সমগ্র এশিয়া মহাদেশের মধ্যে জাপানই সর্বপ্রথম জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইউরোপের সমকক্ষ হয়ে উঠে। তারাই প্রথম তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও প্রথা ভেঙ্গে গ্রহণ করেছিলো আধুনিক ইউরোপের দীক্ষা ও শৌর্যবীর্য।

জাপান-যাত্রার শুরু থেকে জাপানে তিন মাস অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জাপানকেই অবলোকন করেছেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। *জাপান-যাত্রী*তে তিনি জাপানিদের জীবনাচারণ ও সংস্কৃতিকে উপস্থাপন করেছেন নিজস্ব স্টাইল ও ভঙ্গিতে। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> আমি যেমন যেমন দেখছি তেমনি তেমনি লিখে চলেছি। এ কেবল একটা নতুন দেশের উপর চোখ বুলিয়ে যাবার ইতিহাস মাত্র। এর মধ্যে থেকে তোমরা কেউ যদি অধিক পরিমাণে, এমন-কি, অল্প পরিমাণেও 'বস্তুতন্ত্রতা' দাবি কর তো নিরাশ হবে। .... জাপান সম্বন্ধে আমি যা-কিছু মতামত প্রকাশ করে চলেছি তার মধ্যে জাপান কিছু পরিমাণে আছে, আমিও কিছু পরিমাণে আছি, এইটে তোমরা যদি মনে নিয়ে পড় তাহলেই ঠকবে না। (*জাপান-যাত্রী* : ১৩)

সাধারণ ভ্রমণসাহিত্যে দিন-কাল-স্থানের বিবরণই মুখ্য হয়ে থাকে। কিন্তু *জাপান-যাত্রী*তে রবীন্দ্রনাথ শুধু স্থান-কালের বিবরণই দেননি পাশাপাশি তিনি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন বর্ণনাশৈলিতে। এই ভ্রমণসাহিত্যে জাপানের বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক মননশৈলিরও পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ অনুসন্ধানী ও উৎসুক দৃষ্টিতে দেখেছেন জাপানিদের বিচিত্র জীবনধারা, উপভোগ করেছেন প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান; জাপানি সাহিত্য, চিত্রকলা, নৃত্যকলা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেছেন এবং সর্বোপরি অতীত ঐতিহ্যের মধ্য থেকে আধুনিক জাপানের জাগরণের মূল উৎসের সন্ধান করেছেন। তাই বলা যায়, *জাপান-যাত্রী*তে ভ্রমণপিয়াসী রবীন্দ্রনাথের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের অনুসন্ধানী ও দার্শনিকসত্তাই প্রবল হয়ে উঠেছে।

টীকা

১. *বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা* (১৯১৫) বাংলা ভাষায় রচিত জাপান সংক্রান্ত প্রথম পূর্ণাঙ্গ কোন গ্রন্থ। তাছাড়া মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা জাপান নিয়ে লেখালেখি করেছেন তাঁদের মধ্যেও সময়ের নিরিখে হিসাব করলে হরিপ্রভা অগ্রবর্তী অবস্থানে থাকবেন। হরিপ্রভা তাকেদা হচ্ছেন জাপানের বাইরের প্রথম এশিয় নারী, যিনি জাপান সম্পর্কে লেখা বই প্রকাশ করেছেন।

২. 'তোসামারু' জাপানের বিখ্যাত Nippon Yusen Kaisha (NYK) প্রতিষ্ঠানের মালবাহী জাহাজ। বর্তমানকালের জাপানের বিখ্যাত বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান Mitsubishi. এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম বাণিজ্যিক উদ্যমের শুরু জাহাজের কারবার দিয়ে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে। পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানটিই পরিচিতি লাভ করে Nippon Yusen Kaisha (NYK) নামে।

৩. রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ও একান্ত সচিব উইলিয়াম ডব্লিউ পিয়ার্সন (১৮৮১–১৯২৩) ইংরেজ আদর্শবাদী যুবক। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ইংল্যান্ডে। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে জাহাজে বসেই রবীন্দ্রনাথ আট ছত্রের একটি কবিতা লিখে *বলাকা* কাব্যটি তাঁকে উৎসর্গ করেন। কবিতাটির কিছু অংশ:

> আপনারে তুমি সহজে ভুলিয়া থাক,
> আমরা তোমারে ভুলিতে পারি না তাই।
> সবার পিছনে নিজেরে গোপন রাখ,
> আমরা তোমারে প্রকাশ করিতে চাই।

৪. রেভারেন্ড চার্লস অ্যান্ড্রুজ (১৮৭১–১৯৪০) একজন ইংরেজ ধর্মযাজক। শিল্পী রোটেনস্টাইনের বাড়িতে ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়।

৫. মুকুলচন্দ্র দে (১৮৯৫–১৯৮৯) ছিলেন আদি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র, খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী, এবং আধুনিক ভারতের প্রিন্টমেকিং-এর পথিকৃৎ। কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের প্রথম ব্রিটিশ–ভারতীয় অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপান ভ্রমণকালে তাঁর বয়স ছিলো মাত্র একুশ বছর।

৬. জাপানের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী য়োকোহামা টাইক্কন (১৮৬৮–১৯৫৮)। টোকিওতে পৌছে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাড়িতে আতিথ্য নিয়েছিলেন। জাপানের আধুনিক চিত্রশিল্পের পথিকৃৎ বলা হয় তাঁকে।

৭. শ্যোওকিন কাট্সটা জাপানের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯০৫ সাল থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে চিত্রকলার শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৮. রবীন্দ্রনাথ জাপানের কোবে বন্দরে নেমে গুজরাটি এই বণিক মোরারাজির বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন।

৯. বিখ্যাত জাপানি চিত্রশিল্পী তান্জান্ শিমোমুরা (১৮৭৩–১৯৩০)। ১৯০৩ থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ইংল্যান্ডে শিল্পশিক্ষা লাভ করেন। ১৯১৭ সালে তিনি জাপান-সম্রাটের রাজ-চিত্রকর পদের মর্যাদা লাভ করেন।

১০. ১৮৯৪-১৮৯৫ সালে প্রথম চীন – জাপান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সে যুদ্ধে চীন জাপানের কাছে হেরে গিয়ে তাইওয়ানকে ছেড়ে দিতে এবং কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

আবুল মোমেন [সম্পা.] (২০১০)। *রবীন্দ্র-ভ্রমণসাহিত্য সমগ্র* [প্রথম খণ্ড : পাশ্চাত্য, দ্বিতীয় খণ্ড : প্রাচ্য]। প্রথমা, ঢাকা

কুন্তল চট্টোপাধ্যায় (২০১২)। *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। রত্নাবলী, কলকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ভাদ্র ১৪১৭ বঙ্গাব্দ)। *জাপান-যাত্রী*। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা

সত্যশ্রী উকিল [সম্পা.] (২০১৫)। *জাপান থেকে জোড়াসাঁকো* : মুকুলচন্দ্র দে। নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা

সন্তোষকুমার মণ্ডল (২০০৩)। *রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসাহিত্য*। উদ্দালক সাহিত্য প্রকাশন, কলকাতা

হরিপ্রভা তাকেদা (১৯৯৯)। *বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা* (ভূমিকা ও সংগ্রহ : মনজুরুল হক)। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

হাসনাত আবদুল হাই (২০১৪)। *জাপানের সংস্কৃতি*। অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা

Basil Hall Chamberlain (1973), *Japanese Things*, Charles E. Tuttle Company, Tokyo, Japan